সাম্প্রদায়িকতা
(COMMUNALISM)

সাম্প্রদায়িকতা : অর্থ ও ধারণা (Communalism : meaning and concept)

সমাজতত্ত্বে 'সম্প্রদায়' বলতে সাধারণভাবে নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী এমন এক জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতির ভিত্তিতে একই জীবন ধারায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু, এক্ষেত্রে সংকীর্ণ অর্থে সম্প্রদায় বলতে কেবল মাত্র ধর্মীয় বর্গকেই বোঝানো হয়েছে। 'সাম্প্রদায়িকতা' কথাটার উদ্ভব হয়েছে এই 'সম্প্রদায়' শব্দটির থেকে। সেই অর্থে সাম্প্রদায়িকতা হলো ধর্মাশ্রয়ী গোষ্ঠীবদ্ধতা।

তত্ত্বগত ভাবে দেখলে, ধর্মভাবনা ও ধর্মচর্চার পথ ধরে ধর্মের স্বাভাবিক পরিনতি ঘটে মানুষের ধার্মিকতায়। সাম্প্রদায়িকতার চরিত্র ও গতিপথ কিন্তু আলাদা। সেই অর্থে সাম্প্রদায়িকতা আক্ষরিক অর্থে ঠিক ধর্ম চেতনা নয়, একে বলা যায় ধর্মে সংবেদ্ধ এক গোষ্ঠী মানসিকতা।

স্বামী বিবেকানন্দ খুব স্পষ্টভাবে ধর্ম ও সম্প্রদায়-এর মধ্যে এই ভেদরেখাটি বিশ্লেষণ করেছেন, "আমাদের দেশে দুটি শব্দ আছে। শব্দ দুটি হইল 'ধর্ম' ও 'সম্প্রদায়'। আমাদের মতে ধর্মগুলি ধর্মমতের মধ্যেই অনুস্যূত। আমরা পরমত-অসহিষ্ণুতা ছাড়া সবকিছুই সহ্য করি। অপর শব্দটি-'সম্প্রদায়', তাহার অর্থ একটি সমমত-সমর্থক সখ্যবদ্ধ ব্যক্তির দল, যাহারা নিজদিগকে ধার্মিকতার আচরণে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া বলিতে থাকেন, আমাদের পথই ঠিক, তোমরা ভুল পথে চলিতেছ'।" সম্প্রদায় গুলিকে কুয়োর ব্যাঙের সাথে তুলনা করে বিবেকানন্দ বলেছেন, "সম্প্রদায়গুলিরও এই একই পন্থা। তাহাদের নিজেদের মতে যাহারা বিশ্বাস করেনা, তাহাদিগকে তাহারা দূর করিয়া দিতে এবং পদদলিত করিতে চায়" রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব-এর মত অনুসরণ করে বিবেকানন্দ বলেছেন, সাম্প্রদায়িকতার ধর্ম ধর্মে নেই, তা দলে ও হুজুগে। গোষ্ঠী স্বার্থকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই ধরনের মারাত্মক আবেগময় মতবাদ 'অত্যন্ত সম্মোহন' এর পরিবেশ সৃষ্টি করে। (বিবেকানন্দ রচনাবলী, দশম খন্ড)

সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভবে সামাজিক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক দূরত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

Scanned with CamScanner

অন্তর্গোষ্ঠী-বহির্গোষ্ঠী মানসিকতায় এই দূরত্ব লালিত হয়। সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে শিশু এই গোষ্ঠী মানসিকতা আত্মস্থ করতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের 'ধর্ম ব্যবসায়ী' আখ্যায় অভিহিত করে বলেছেন, "দূরত্বের ভেদ এরা নিজেদের চারদিকে অত্যন্ত মজবুত করে গেঁথে রেখেছে, এতে করে সকল মানুষের সঙ্গে সত্য যোগে মনুষ্যত্বের যে প্রসার হয় তা এদের মধ্যে বাধাগ্রস্থ হয়েছে। ধর্মগত ভেদবুদ্ধি সত্যের অসীম স্বরূপ থেকে এদের সংকীর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড) কোনো কোনো সমাজ এমনভাবে বিভক্ত হয় যে সেখানকার ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি নিজেদের মধ্যে পার্থক্য অনুভব করে এবং কখনো কখনো বিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়ে— পরস্পরের প্রতি এই ধরনের বিদ্বেষমূলক আচরণকে সাম্প্রদায়িকতা বলে। যদিও ধর্মীয় আনুগত্যকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতা আবর্তিত হয় তবুও ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে একে এক করে দেখলে ভুল হবে। বদ্রুদ্দিন উমর-এর মতে, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিষ্ঠা স্বতন্ত্র বিষয়। ধর্মীয় বিধান এবং আচার -রীতির প্রতি নিষ্ঠাকে ধর্মনিষ্ঠা বলা যায়। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা পৃথক বিষয়। তাঁর মতে, কোনো ব্যক্তির মনোভাবকে তখনই সাম্প্রদায়িক বলা যায় যখন সে এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ এবং ক্ষতিসাধন করতে প্রস্তুত থাকে। এক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতিসাধন করার মানসিক প্রস্তুতি কোনো ব্যক্তিগত স্তরের বিরোধিতা থেকে সৃষ্ট নয়।

সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবেই অন্যের সঙ্গে বিরোধমূলক সম্পর্কের সৃষ্টি। ব্যক্তি এখানে গৌণ, মুখ্য হল সম্প্রদায়। সাম্প্রদায়িকতার যোগ হচ্ছে সম্প্রদায়ের সঙ্গে। ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচার আচরণের জন্য অন্যের বিরুদ্ধাচরণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের সদস্যদের বিরুদ্ধাচরণ এবং ক্ষতিসাধনের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও প্রসার। ধর্মের সঙ্গে সেই কারণে সাম্প্রদায়িকতার কোনো প্রয়োজনীয় তত্ত্বগত সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। ধর্মের দুটি দিক হতে পারে— আধ্যাত্মিক (Spiritual) এবং আচারগত (Ritualistic)। সাম্প্রদায়িকতাবাদ ধর্মের আধ্যাত্মিক দিকটিকে গুরুত্ব দেয় না, যাবতীয় গুরুত্ব আরোপ করে তার আচারগত দিকটির ওপর। অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি তাঁর দৈনন্দিন জীবনে খুব একটা ধর্মাচরণ নাও করতে পারেন। আবার অন্যদিকে প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসী বা আধ্যাত্মিক মানুষকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হতে কম দেখা যায়। সাম্প্রদায়িকতাবাদ ধর্মকে একটি প্রতীক (Symbol) হিসেবে ব্যবহার করে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং বিশেষ করে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে সচেষ্ট হয়। সুতরাং বলা যায় যে ধর্ম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার।

অধ্যাপক এ. আর. দেশাই ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃত সত্তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন— সাম্প্রদায়িকতা বিভিন্ন ধর্মের কায়েমী স্বার্থবাদীদের মধ্যে সংগ্রামের ছদ্মবেশ মাত্র।

Scanned with CamScanner

এই বিরোধকে সাম্প্রদায়িক রূপে পরিণত করে। তাঁর মতে, সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মধ্যে ধর্মীয় ব্যাপারের কোনো ভূমিকা নেই। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রকৃতপক্ষে লাভ-লোকসান, আসন সংখ্যা ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির রাজনীতি।

সাম্প্রতিককালে অনেক সমাজবিজ্ঞানী ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস-আশ্রয়ী বিশ্লেষণ করেছেন। এঁদের মধ্যে ডঃ বিপান চন্দ্রর আলোচনার নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ভিত্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐতিহাসিক ডঃ বিপান চন্দ্র সাম্প্রদায়িকতাকে এক 'ভ্রান্ত চেতনা' (false consiouness) হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। মার্ক্সীয় ধারায় এই ধারণাটিকে বিপান চন্দ্র তাঁর বিশ্লেষণের চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, বিগত দেড়শ বছরের ইতিহাস পরিক্রমায় সাম্প্রদায়িকতাবাদ সৃষ্ট হয়েছে 'ভ্রান্ত চেতনা'কে ভিত্তি করে।

যে চেতনার মধ্যে বাস্তব ভ্রান্ত ভাবে বা বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হয় তাকেই 'ভ্রান্ত চেতনা' বলা যায়। সঠিক চেতনার অভাবই এই অবস্থার সৃষ্টি করে। বিপান চন্দ্রর মতে, ধর্মীয় বিভিন্নতার ফলে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতাবাদ জন্ম নেয়নি; সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ব্যবহার ধর্মীয় বিভিন্নতাকে সাম্প্রদায়িক বিভেদে রূপান্তরিত করেছে। সাম্প্রদায়িকতা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে একটি সমরূপ (homogeneous) গোষ্ঠীহিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করে এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যেকার সংঘর্ষই প্রকৃত সংঘর্ষ— এমনই এক 'ভ্রান্ত চেতনা' সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায়। এরই মাধ্যমে শ্রেণি সংগ্রামের পরিবর্তে এক ধর্মভিত্তিক অন্তর্গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য ধর্মভিত্তিক বহির্গোষ্ঠীর সংঘর্ষকে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়। এইভাবে সাম্প্রদায়িকতা গণচেতনাকে ভুল পথে পরিচালিত করতে সক্রিয় থাকে। এই পথেই ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের ব-কলমে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রেণিভিত্তিক রাষ্ট্র, ধর্মীয় শাসনের আড়ালে শ্রেণি শাসন ও শোষণ চলতে থাকে।

সংখ্যালঘু গোষ্ঠী

সংখ্যালঘু গোষ্ঠী (Minority) প্রত্যয়টি সমাজতত্ত্বে বহুল ব্যবহৃত হয়। সমাজতত্ত্বে তাকেই সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বলা হয় যার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি আছে—

১। এই গোষ্ঠীর সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর বৈষম্যের ফলে সমাজে অসুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। বৈষম্য তখনই ঘটে যখন অধিকার ও সুযোগগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মানুষের কাছে উন্মুক্ত থাকে কিন্তু এই গোষ্ঠীর সদস্যদের কাছে থাকে না।

২। এই গোষ্ঠীর সদস্যরা সাধারণত নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের থেকে আলাদা মনে করে এবং তাদের আচরণেও এই মনোভাব প্রতিফলিত হয়।

৩। সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্যদের দলগত সংহতি ও সহমর্মিতা বোধ থাকে। কুসংস্কার ও বৈষম্যের শিকার হয়ে তাদের এই বোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

৪। এই গোষ্ঠীর জনগণ বৃহত্তর জনসম্প্রদায় থেকে ব্যবহারিক ও সামাজিক দিক দিয়ে

Scanned with CamScanner

সাধারণত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। তারা সাধারণত নির্দিষ্ট মহল্লা বা অঞ্চলে জড়ো হয়ে পাশাপাশি বসবাস করাকেই শ্রেয় মনে করে।

৫। সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক খুব কমই ঘটে থাকে। সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্যরা সক্রিয়ভাবে অন্তর্গোষ্ঠীর বিবাহের সপক্ষে থাকে যাতে তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সজীব ও ক্রিয়াশীল রাখা যায়।

কে. বি. কৃষ্ণ তাঁর 'দ্য প্রবলেম অব মাইনরিটিস্' গ্রন্থে ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘু সমস্যাকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে মুসলমান, শিখ, খ্রিষ্টান প্রভৃতি ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবীরা শিক্ষা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় সাধারণভাবে অনগ্রসর। এই অসমতাই এদের মধ্যে বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই বিরোধই সংখ্যালঘু সমস্যা নামে অভিহিত হয়।

ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও প্রসার—

রাম আহুজার মতে, ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উত্তরোত্তর প্রসার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার মানসিকতা সৃষ্টি করছে। উদাহরণ হিসেবে মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান ইত্যাদি সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করা যায়। ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু এবং সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পর্কের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সমস্যা বলতে আমরা বুঝি হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কের সমস্যাকে।

ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতাবাদের শুরু কবে থেকে সে বিষয়ে পন্ডিতরা একমত নন। বদরুদ্দিন উমর-এর মতে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান শত শত বছর পাশাপাশি বাস করা সত্ত্বেও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়নি। হিন্দু-মুসলমানের এই ব্যবধান প্রথম থেকে সক্রিয় বিরোধে পরিণত না হলেও প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগেই এক অস্বাস্থ্যকর বিভেদ চেতনা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বর্তমান ছিল। এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক পর্যায়ে যে পরিমাণ লেনদেন হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি। উমর-এর মতে, এই ভেদজ্ঞানকে তাই পুরোপুরি ইংরেজদের সৃষ্ট বলা চলে না। যদিও ইংরেজরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার ধর্মীয় এবং সামাজিক ব্যবধানকে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজনে সক্রিয় প্রচেষ্টার সাহায্য রাজনৈতিক বিরোধে পরিণত করেছিল। এই পরিণতির নামই সাম্প্রদায়িকতা।

কারও কারও মতে, প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল গোষ্ঠীগত সত্তা। একদিকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের যেমন নিজস্ব ধর্মীয় আচার-আচরণ পালনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা ছিল না, আবার অন্যদিকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে অন্যান্য আর্থ-সামাজিক স্তরে আদান-প্রদানও অব্যাহত ছিল। এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল ভারতীয় সংস্কৃতি। এই সময়কালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় প্রশ্নে মাঝে-মধ্যে বিবাদ

Scanned with CamScanner

হলেও তা ভয়াবহ প্রাণঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ পরিগ্রহ করেনি। সাম্প্রদায়িক সত্তার মূলে থাকে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা শুরু হয় ঔপনিবেশিক শাসনকালে। এই সময় ভারতবর্ষের ইতিহাস গোষ্ঠী সত্তা থেকে সাম্প্রদায়িক সত্তায় পরিবর্তনের ইতিহাস। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে রাজনৈতিক প্রশ্নে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধ উভয় সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থের প্ররোচনায় ও ব্রিটিশ শাসকদের কৌশলে উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করেছিল। এই সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'বিভাজন এবং শাসন'—এর নীতির ফলেই ভারতীয় সমাজে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি গড়ে উঠেছে। 'বিভাজন এবং শাসন' এর নীতির ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য ইংরেজ প্রশাসকরা সবসময়ই বোঝাতে চেয়েছেন যে ভারতবর্ষ কখনোই একটা জাতি হিসেবে গড়ে উঠেনি। তাঁদের মতে, ভারতীয় সমাজ হল 'একাধিক সমাজ অধ্যুষিত সমাজ' (Society of Societies) যার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের চিরন্তন বিরোধের কথা বলা হত।

১৯৩১ সালে মহাত্মা গান্ধী গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ব্রিটিশ শাসনকালেই শুরু হয়। তিনি হিন্দু-মুসলমান বিভেদের জন্য ব্রিটিশ প্রশাসনকে মূলত দায়ী করেন। তিনি বিখ্যাত আমেরিকান সাংবাদিক লুই ফিসার-এর কাছে মন্তব্য করেছিলেন যে যতদিন পর্যন্ত তৃতীয় পক্ষ ইংরেজরা ভারতে আছে ততদিন সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেশের ক্ষতি করতে থাকবে। ভাইসরয় লর্ড মিন্টো ঘোষণা করেছিলেন যে ব্রিটিশ আধিপত্য রক্ষার জন্য হিন্দু এবং মুসলমানদের পৃথক রাখা প্রয়োজন। গান্ধীজীর মতে, ভারতবর্ষ দু'টো জাতিতে বিভক্ত নয়। এখানে সর্বজনীন সংস্কৃতি আছে। উত্তর ভারতের হিন্দু-মুসলমানরা উভয়েই হিন্দি ও উর্দু ভাষা বুঝতে পারে। তামিলনাড়ুর হিন্দু-মুসলমান উভয়েই তামিল ভাষায় কথা বলেন। বাংলায় উভয়েরই ভাষা বাংলা। তাঁর মতে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অধিকাংশ সময় গরু নিয়ে কোনো ঘটনা বা ধর্মীয় শোভাযাত্রা থেকে উত্তেজনা সঞ্চারের ফলে ঘটে থাকে। অর্থাৎ কুসংস্কারের কারণেই দু-পক্ষের বিবাদ শুরু হয়, পৃথক জাতিসত্তার কারণে নয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সূত্রপাত কবে থেকে এবং কোন ধরনের আর্থ- সামাজিক পটভূমিতে— এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ। উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার উৎস মধ্যযুগের তুর্কী-মুঘল শাসনে হিন্দুপীড়ন, ব্রিটিশ আমলে 'বিভেদ এবং শাসনের' নীতি, ইংরেজি শিক্ষায় সাধারণভাবে হিন্দুর প্রাগ্রসরতা, হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং অর্থ-সম্পদে তাদের উন্নততর অবস্থা। অধ্যাপক শরীফ-এর মতে, এইসব ধারণা গোটা উপমহাদেশের জনজীবনে মনস্তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক—উভয় ক্ষেত্রেই অপরিমেয় ক্ষতি সাধন করেছে। তাঁর মতে, দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়েছে ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই। এর আগে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বা শাসক-শাসিতের মানস-দ্বন্দ্ব এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পীড়ন-বঞ্চনা সংঘর্ষ-সংঘাত ঘটাতে পারেনি। কেননা, শহরে শাসন কেন্দ্রে শাসকের বিরুদ্ধে

Scanned with CamScanner

দাঁড়ানোর শক্তি-সাহস ছিল না হিন্দুর। আর গ্রামে গ্রামে দেশজ মুসলমানরা ছিল অন্ত্যজ শ্রেণির, নিম্ন বর্ণের এবং নিম্নবর্গের ক্ষুদ্র বৃত্তিজীবী, আর নিতান্তই উনজন। এরা ছিল অর্থ-সম্পদ-শিক্ষার অধিকারী বর্ণ হিন্দুর প্রশাসনে।

অধ্যাপক এস. সি. দুবের মতে, ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বেশ কিছু ধারণা স্থায়ীভাবে শিকড় গেড়ে আছে। প্রথম ধারণাটি হল, অস্ত্রের জোরেই ইসলাম ধর্ম ভারতবর্ষে প্রসার লাভ করেছিল। দ্বিতীয় ধারণাটি হল, তৎকালীন সমাজ এতটাই বিভক্ত এবং ক্ষয়িষ্ণু ছিল যে মুসলমান আগ্রাসনকে বাধা দেওয়ার মতো শক্তি তার ছিল না। তৃতীয় ধারণাতে, মুসলমান ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে দীর্ঘ সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করে ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের প্রসারের কারণ হিসেবে মুসলমান শাসনের সহায়তাকে চিহ্নিত করা হয়। চতুর্থত, এটা মনে করা হত যে মুসলমান শাসকদের সময়কালে মুসলমানেরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় বিশেষ সুবিধাভোগ করত। অধ্যাপক এস. সি. দুবে মনে করেন যে এই প্রতিটি ধারণাই হয় ভুল, নয় বড়ো জোর আংশিক সত্য।

ভারতীয় সমাজে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব নিয়ে নানা মত রয়েছে। অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে, ব্রিটিশ আমলে গৃহীত 'বিভাজন ও শাসনের' নীতির জন্যই ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি গড়ে উঠেছে। কারও কারও মতে, সাম্প্রদায়িকতার উৎস নিহিত আছে মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতার মধ্যে। আবার কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী সাম্প্রদায়িকতার অর্থনৈতিক দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেই সময় জমিদার ও মহাজন শ্রেণির অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু। অন্যদিকে অধিকাংশ মুসলমান জনসাধারণের স্থান ছিল নিচু বর্গে, তাঁরা ছিলেন দরিদ্র কৃষক শ্রেণির। সামগ্রিকভাবে একথা বলা যায় যে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা প্রধানত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবদান।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার ভূমিকা

স্বাধীনতার পর এতগুলি বছর পার করেও আজকের ভারতবর্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় সাম্প্রদায়িকতা। একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেও ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা হল সাম্প্রদায়িকতা।

ব্রিটিশ ভারত থেকেই স্বাধীন ভারতবর্ষ বহন করে এনেছে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদের উত্তরাধিকার। ব্রিটিশ শাসনের অবসানকালে ভারতবর্ষের নতুন শাসকেরা আশা করেছিল যে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে শান্তির বাতাবরণ তৈরি করবে। কিন্তু তা যে শুধুই অলীক কল্পনা ছিল একথা এখন আর প্রমাণ করার দরকার হয় না। দেশ বিভাজন জনমানসে যে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয় তা আজও ভারতবর্ষের সমাজ-রাজনীতিতে প্রতিফলিত হচ্ছে।

বিপান চন্দ্রর মতে, জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা— উভয়েই একই ধরনের একটি

Scanned with CamScanner

আধুনিক প্রক্রিয়ার ফল। এই প্রক্রিয়া হল ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কাঠামো। কারো কারো মতে, সাম্প্রদায়িকতা হল জাতীয়তাবাদের আলো না পড়া, অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক। জাতীয়তাবাদ আদিম বিভাজনসূত্রগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে সমাজকে সংহত করে, চেতনাকে একসূত্রে গেঁথে একই দিকে বাহিত করতে সচেষ্ট থাকে। সাম্প্রদায়িকতা বহুমুখী। কখনো ধর্ম, কখনো ভাষা কিংবা সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান। ভারতবর্ষে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা এই বহুমুখীনতার একটি প্রধান অংশ। বিপান চন্দ্র মনে করেন, ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদ গভীরে প্রবেশ করতে পারল না বলেই সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হল।

ভারতবর্ষের সংবিধান এবং সাম্প্রদায়িকতা : যদিও ভারতের সংবিধানে সাম্প্রদায়িকতার কোনো জায়গা নেই তবুও এদেশের ব্যক্তিগত পারিবারিক আইনগুলি কিন্তু সম্প্রদায় ভিত্তিক। সম্প্রদায়ভেদে এদেশের ব্যক্তিগত পারিবারিক আইনগুলি পরিচিত, যেমন— হিন্দু আইন, মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, খ্রিষ্টান আইন ইত্যাদি। ধর্মাচরণের স্বাধীনতা ভারতীয় সংবিধানের একটি মৌলিক অধিকার। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকার ও অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হল সংবিধানের ২৯ নম্বর ধারায়। সংবিধানের ৩০ নম্বর ধারায় ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের নিজেদের পছন্দ মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করবার অধিকার দেওয়া হল। বস্তুত ভারতবর্ষের সংবিধানে ধর্ম এবং রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো প্রকার প্রাচীর তৈরি করা হয়নি। সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হলেও ব্যক্তিগত আইনগুলি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসনের উপর ভিত্তি করে রচিত। এই আইনগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সংবিধানের ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ এবং ৪৪ নম্বর ধারা উল্লঙ্ঘন করে চলছে বলে অনেকে মনে করেন।

ধর্মান্তর গ্রহণ সকল ব্যক্তিগত পারিবারিক আইন অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হিসেবে স্বীকৃত। রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকবে আর সমস্ত প্রভাবশালী ধর্ম রাষ্ট্রের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করে যাবে— একে ধর্মনিরপেক্ষতা বলা যায় না। এই অবস্থা সাম্প্রদায়িকতাবাদ সৃষ্টির পটভূমি তৈরি করে। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী রজনী কোঠারি মনে করেন, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদের জনক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের পরিচালকরা কখনও শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আচার পালন করেন, কখনও বা রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি : রজনী কোঠারির মতে, সমকালীন ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িকতাবাদ বুঝতে গেলে শুধু ইতিহাস -আশ্রয়ী বিশ্লেষণ দিয়ে তা বোঝা যাবে না। এর প্রকৃত চরিত্র অনুধাবন করতে গেলে শাসক শ্রেণির অস্তিত্ব রক্ষার রাজনীতিকে বুঝতে হবে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাজনীতি থেকে ক্রমশ সরে গিয়ে তা নির্বাচন ভিত্তিক ক্ষমতার রাজনীতিতে উত্তরোত্তর আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ক্ষমতা লাভের আশায়, দেশের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে তাৎক্ষণিক ফল লাভের জন্য তারা ধর্মীয় সম্প্রদায়গত ভাবপ্রবণতাকে ইন্ধন জুগিয়েছে— এরই পরিণতি সাম্প্রদায়িকতাবাদ। কোঠারির মতে, সমাজে যখন অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে, সামাজিক

Scanned with CamScanner

প্রতিষ্ঠানগুলির অবক্ষয় ঘটতে থাকে এবং নেতৃত্বের সঙ্কট দেখা দেয়— সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উদ্ভবের সেটাই উপযুক্ত সময়। রুডলফ এবং রুডলফ-এর মতে ভারতবর্ষে আন্তঃসম্প্রদায় বৈরিতা প্রতিহত করা সম্ভব হত রাজনীতিগত ভাবে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সমকালীন ভারতবর্ষের মূল রাজনৈতিক সংস্কৃতি উল্টে সাম্প্রদায়িকতাবাদকে আশ্রয় করে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখছে।

ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতাবাদের আলোচনায় মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায় মইন শাকীর আলোচনায়। তাঁর মতে, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ভারতবর্ষে আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। সাম্প্রদায়িকতাবাদ সম্পর্কে তাঁর মূল কথা হল- ভারতবর্ষের শাসকগোষ্ঠীর শ্রেণিগত অবস্থানের কারণেই ভারতবর্ষে ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কোনো জোরালো আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। ভারতবর্ষে ধনতান্ত্রিক শক্তি এমনভাবে চালিত হয়ে চলেছে যে সমাজে শিকড় গেড়ে থাকা সামন্ততান্ত্রিক শক্তির আর্থ-রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থান অটুট থেকে যাচ্ছে। সামন্তবাদের প্রতিনিধি শাসকশ্রেণি কখনো তাদের শ্রেণি স্বার্থ এবং চেতনার সীমা লঙ্ঘন করেনি। জনমানসে শ্রেণিমনস্কতা এবং যুক্তিবাদ সৃষ্টির পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতেই শাসকশ্রেণি সুচতুরভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদকে ব্যবহার করে চলেছে। সাম্প্রদায়িকতাবাদ নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করতে গিয়ে রণধীর সিং-ও প্রায় একই বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর মতে সাম্প্রদায়িকতা ব্যাপারটি শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার জন্য সুচিন্তিতভাবে ব্যবহার করে চলেছে। এর উদ্দেশ্যে হল নির্বাচনে ভোট পাওয়া, জনমানসে শ্রেণি চেতনা সৃষ্টি রোধ করা, জনগণকে বিভক্ত রাখা এবং এসবের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক প্রভুত্ব বজায় রাখা। সাম্প্রদায়িকতার বিবাদ যতদিন চালানো যাবে শ্রেণি সংগ্রামকে ততদিন দুর্বল রাখা সম্ভব হবে।

কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানীর মতে, ভারতবর্ষের মতো বহুত্ববাদী দেশে ব্যক্তির পরিচিতি-সত্তার একাধিক স্তর থাকে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আত্মপরিচিতির এই ভিন্নতা মর্যাদা পায়। ধর্মীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রদ্রোহী চিহ্নিত করা হলে তাকে বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া যায় না। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন -এর মতে, ভারতীয় সংবিধান প্রণেতারা ভারতীয় জনগণের বিস্তারিত ধর্মীয় বহুত্ববাদের উপযুক্ত স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন। ভারতীয়ত্বের ধারণা কোনো একটি বিশেষ ধর্মীয় পরিচয় থেকে নির্ণীত হোক তা তাঁরা চাননি। ডক্টর আম্বেদকার-এর বক্তব্য থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়— 'যদি ভারতীয় মুসলিমরা একটি পৃথক জাতি হিসেবে গণ্য হয়, তবে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ একটি জাতি নয়।' ডঃ অমর্ত্য সেন-এর মতে, ভারতীয় সমাজের বৈচিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে একটি মূলগত সমদর্শিতার নীতি সুনিশ্চিত করা এবং কার্যকরীভাবে রাষ্ট্রকে প্রতিটি ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা ছাড়া ভারতবর্ষে অন্য কোনো বাস্তব রাজনৈতিক বিকল্পের অস্তিত্ব নেই। অনেকদিন আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ভারতীয় সমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এই ভেবে যে, ভারতবর্ষের জনগণ যদি আত্মপরিচয়ের একই বিন্দুতে সংহতি অর্জন না করতে পারে তবে শান্তি সমৃদ্ধির আশা মরীচিকায় পরিণত হবে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন— "পলিটিকসের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে যেটুকু

Scanned with CamScanner

চালি দেওয়া মিল হতে পারে, সে মিলে আমাদের চিরকালের প্রয়োজন টিকবে না। এমনকি পলিটিকসের এই তালিটুকু বরাবর অটুট থাকবে এমন আশা নেই, ওই ফাঁকির জোড়টার কাছে বারেবারেই টান পড়বে। যেখানে গোড়ায় বিচ্ছেদ সেখানে আগায় জল ঢেলে গাছকে চিরদিন সবুজ রাখা অসম্ভব। আমাদের মিলতে হবে সেই গোড়ায়, নইলে কিছুতেই কল্যাণ নেই।"

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতাবাদের উল্লেখযোগ্য নজীর দেখা যায় ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে। রাম জন্মভূমি— বাবরি মসজিদ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কম-বেশি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির সুযোগ ঘটে। ভোটের লাভ-লোকসান হিসেব করে সংকীর্ণ রাজনীতির স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার যে দেশের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে এখনও স্তিমিত হতে দেয়নি, তার প্রমাণ সাম্প্রতিক গোধরা এবং গুজরাট কান্ড। মহাত্মা গান্ধির গুজরাট হঠাৎ করে আজকের সাম্প্রদায়িক হানাহানির গুজরাটে পরিণত হয়ে যায়নি। এর একটি সামাজিক প্রেক্ষিত আছে। এর প্রস্তুতি পর্ব অনেক দিনের বলেই ধরে নেওয়া যায়। দাঙ্গা-বিশ্লেষকদের মতে, এবারের গুজরাটের ঘটনায় একটা নতুন দিক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা হল আগের মতো বৃহত্তর নাগরিক সমাজ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করেননি। তাঁরা হানাহানি রোধে এগিয়ে আসেননি। কেন এমন হল— এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ব্রেমান-এর গবেষণার ফলাফলে। তাঁর মতে, গুজরাটে দাঙ্গা কোনো নতুন ঘটনা নয়। তা স্বাধীনতার আগে যেমন হয়েছে, পরেও তেমনি হয়েছে। কিন্তু এর আগে কখনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঠেকাবার লোকের এত অভাব হয়নি। বিশেষ করে আহমেদবাদের সংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের এক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সাম্প্রদায়িকতা এই সব সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণির জীবনচর্যাকে ভুল পথে পরিচালিত করতে পারেনি। এরাই বৃহত্তর সমাজে ধর্মীয় ভেদাভেদকে নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখতে এক স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ-মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন করত। সংগঠিত শিল্পের দুর্বলতা এবং অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে শিল্প শ্রমিকদের ভূমিকাও উত্তরোত্তর গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী ঐক্য ও সংগ্রাম বৃদ্ধি পেলেই সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই মৌলবাদী শক্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে সংগ্রামহীন হতাশাগ্রস্ত সময়কালে। যারা প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িকতার পক্ষপাতিত্ব বা পৃষ্ঠপোষকতা করে, দাঙ্গা লাগায় তারাই মৌলবাদী শক্তি। হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার পথে এরা সব সময় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। জনসংখ্যার দিক থেকে এদের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও ভারতীয় রাজনীতিতে এরা খুব প্রভাবশালী। আর একদল মানুষ আছেন যাদের ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িক মনোভাব অবচেতন মনে লুকিয়ে থাকে। তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচারের ও সংগঠনের সংস্পর্শে এসে এই 'সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতাই (Latent Communalism) প্ররোচনামূলক পরিস্থিতির শিকার হয়ে বিপজ্জনক রূপ ধারণ করতে পারে। সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতা এইভাবে বিশাল সংখ্যার জনসমষ্টিকে চেতনাহীন

Scanned with CamScanner

যুক্তিবোধহীন ধর্মান্ধ মানুষে পরিণত করে। এই পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সহজেই ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে। মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগিয়ে শাসন ক্ষমতা লাভ করতে চায় কোনো কোনো রাজনৈতিক দল। সেই লক্ষ্যে সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতাকে জাগিয়ে তোলাই তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার পুনরুত্থান ও প্রসার নিয়ে বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি ও আদিত্য মুখার্জি 'ইন্ডিয়া আফটার ইন্ডিপেনডেন্স' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে সমাজ জীবনে সাম্প্রদায়িক বৈরিতার বহিঃপ্রকাশ না থাকলেও প্রচ্ছন্নভাবে তা থাকতে পারে। চরম মুহূর্তে তা প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অসম বিকাশ ভারতীয় সমাজে নানা সমস্যা সৃষ্টি করেছে যার পরিণতিতেই সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের উর্বর জমি রচিত হয়। সাম্প্রতিককালে শহরের দরিদ্র এবং অপরাধীদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিশেষভাবে সক্রিয় হতে দেখা গেছে। তাঁদের মতে, অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ দেখতে পাওয়া যায় এবং সুবিধাবাদী রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতার বিপদকে বৃদ্ধি করেছে।

সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা ঃ সমাধান কোন পথে ?

অধ্যাপক বিপান চন্দ্রর মতে, বর্তমান ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতি সবচেয়ে বড়ো যে সমস্যার সম্মুখীন তা সম্ভবত সাম্প্রদায়িকতাবাদই। এই সমস্যা জাতীয় সংহতি বিরোধী শক্তিগুলির বৃদ্ধিকে চিহ্নিত করে যারা ক্রমান্বয়ে ভারতবর্ষের ঐক্যের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে চলেছে। অধ্যাপক চন্দ্র মনে করেন, সাম্প্রদায়িক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হলে একথা মনে করতে হবে যে এ এক দীর্ঘ যাত্রা। বহু প্রজন্ম ধরে যে ঐতিহাসিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার কোনো তাৎক্ষণিক সমাধান সম্ভব নয়। তাঁর মতে, সন্ধি, আপস রফা কিংবা চুক্তি প্রভৃতি সমাধান সূত্রগুলি অনেক সময় উল্টে সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। ভারতীয় সমাজের সাম্প্রদায়ীকরণ এক দীর্ঘায়িত প্রক্রিয়া, সেই কারণে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানসূত্র নিহিত রয়েছে নিঃসাম্প্রদায়ীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা ও তাকে উদ্দিষ্ট পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর সাম্প্রদায়িকতার সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মৌলিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। এই সাম্প্রদায়িকতাবাদের সামাজিক ও শ্রেণিগত চরিত্রেও পরিবর্তন এসেছে। ব্যবসায়ী- মহাজনরা এখন ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার এক প্রধান সামাজিক ভিত্তি। গ্রামীণ ভারতবর্ষে কৃষি- মজুর এবং ধনী কৃষকদের মধ্যে শ্রেণি সংঘাত অনেক ক্ষেত্রেই জাতভিত্তিক বা সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ করছে। বিপান চন্দ্র'র মতে, ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীরা এখনও সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিরোধী বা অন্তত সাম্প্রদায়িকতাবাদের পক্ষে সক্রিয় নয়।

সি. জি. শা সাম্প্রদায়িকতাবাদের মার্ক্সীয় বিশ্লেষণে বলেছেন, 'শোষিত শ্রেণিগুলির বাস্তব স্বার্থ অভিন্ন। বাস্তব স্বার্থের মধ্যেকার এই মিল এবং তার থেকে উদ্ভূত সাধারণ দাবীগুলির ভিত্তিতে যুক্ত সংগ্রামই শুধু তাদের ঐক্য গড়ে তুলতে পারে। যত মাত্রায় এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামগুলি

Scanned with CamScanner

হবে, ততই তারা হিন্দু বা মুসলিম পরিচয়ে নিজেদের দেখা ছেড়ে দিয়ে শ্রমিক, কৃষক ইত্যাদিরূপে নিজেদের দেখা শুরু করবে। ক্রমবর্ধমান হারে সাম্প্রদায়িক চেতনার জায়গা নেবে শ্রেণিচেতনা।'

বি. ডি. শা-র মতে, এই ভাবে সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে মোকাবিলা করা এবং নির্মূল করার একমাত্র কার্যকরী উপায় হল হিন্দু ও মুসলিমদের, তাদের সাধারণ স্বার্থের প্রতিফলনকারী ভিত্তির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা— এইভাবে তাদের শ্রেণিগত সংগঠনকে শক্তিশালী করে তোলা। ঐক্যবদ্ধ শ্রেণিভিত্তিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ফলে তাদের শ্রেণিচেতনা যত বৃদ্ধি পাবে, ততই তাদের সাম্প্রদায়িক চেতনা লুপ্ত হবে। অর্থাৎ নিজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম যত বৃদ্ধি পাবে সেই অনুপাতে জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাবোধ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকবে।

অধ্যাপক বিপান চন্দ্র আধুনিক ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার উৎস এবং তার সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতি মৌলিকভাবে সাম্প্রদায়িকতাপন্থী না হলেও, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিন্যাস সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রসারের সহায়ক অবস্থা তৈরি করে চলেছে। সাম্প্রদায়িকতাবাদ হল সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির নির্দিষ্ট অবস্থার ফসল। এই ধরনের সহায়ক পরিস্থিতি না থাকলে সাম্প্রদায়িকতা দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারত না। ঐ সহায়ক সামাজিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের কোনো ধরনের প্রচেষ্টা না থাকলে সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রসার হতেই থাকবে। সাম্প্রদায়িক মনোভাব পুষ্ট হয়েছে ভোগবাদী-মুনাফালোভী মানসিকতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং আদর্শহীনতার মাধ্যমে। এর ফলে সমাজে এক ধরনের নৈতিক শূন্যতা গড়ে উঠেছে। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে দেশের এক উল্লেখযোগ্য অংশের মানুষের নিরক্ষরতা এবং অসচেতনতার জন্য। সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা সমাধান করতে হলে দেশের মানুষের শিক্ষা ও সচেতনতার জন্য ধারাবাহিক কর্মসূচি চালু রাখতে হবে। তবে এক্ষেত্রে পাঠক্রমকেও বিজ্ঞানভিত্তিক, যুক্তিবাদী এবং অসাম্প্রদায়িক করে গড়ে তোলা দরকার। অনেকক্ষেত্রে শিশু বয়স থেকেই পাঠক্রমের মাধ্যমে শিশুমনে অন্ধ বিশ্বাস, যুক্তিহীনতা, সাম্প্রদায়িক মনোভাব অনুপ্রবেশ করিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানীর অভিযোগ অল্পবয়স থেকেই শিশুদের মনে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সাম্প্রদায়িক সমস্যার অবসানে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ধর্মীয় মৌলবাদের প্রভাব অবশ্যই খর্ব করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে চরিত্রগত বিচারে হিন্দু মৌলবাদ ও মুসলিম মৌলবাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ই সমান বিপজ্জনক। উভয়ের বিরুদ্ধেই আপসহীন সংগ্রাম প্রয়োজন। কারও কারও মতে, সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা বেশি বিপদজ্জনক কারণ তার মধ্যে ফ্যাসিবাদের সম্ভাবনা থাকে। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন-এর মতে, 'হিন্দুবাদী রাজনীতির দুর্বলতার প্রধান কারণ তার টিকে থাকার ভিত্তি বিভিন্ন স্তরে বিরাজমান অজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। ওই অজ্ঞতার সাহায্যে কুসংস্কারের অন্ধ আকর্ষণকে ব্যবহার করা হয়েছে জঙ্গি

Scanned with CamScanner

রক্ষণশীলতাকে শক্তিশালী করার তাগিদে এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদকে মদত দেওয়ার জন্য।' অধ্যাপক সেন মনে করেন যে ওই অজ্ঞতাকে উন্মোচিত এবং আলোকিত করার জন্য চূড়ান্ত প্রতিবাদের আশু প্রয়োজনীয়তা আছে।

ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হল সেই সময় 'ধর্ম-নিরপেক্ষতা' নীতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেকিউলারিজম্-এর অর্থ করা হয়েছে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। ধর্মকে বর্জন করে চলার কথা বলে সেকিউলারিজম্। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এর এক সুবিধাবাদী অর্থ গড়ে তোলা হল— ধর্ম-বিযুক্ত রাষ্ট্র নয়, শুধু রাষ্ট্র বিশেষ কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাত করবে না, সব ধর্মকেই সমান চোখে দেখবে। ভারতবর্ষ যেহেতু একটি বহুবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাই এখানে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী নিজেদের ভাবধারা প্রচারের এবং ধর্মীয় সংগঠন গড়ে তোলার সুযোগ পায়। ভারতবর্ষের রাজনীতিগত ঐতিহ্য অনুসরণ করলে একে 'রিলিজিয়াস নিউট্রালিটি' বলা যায়। রাধাকৃষ্ণণ ভারতবর্ষের 'সেকিউলারিজম'কে রিলিজিয়াস ইমপারশিয়ালিটি' বলেছেন। সমাজতাত্ত্বিক ম্যারিয়ট একে 'মালটিরিলিজিয়াস কালচারাল পলিসি' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নির্বাচন-ভিত্তিক রাজনীতির কারণে ভারতীয় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবক্ষেত্রে 'ধর্মনিরপেক্ষতার' নীতিকেও অনুসরণ করে চলা সম্ভব হল না। তারই সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করল প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মৌলবাদীরা। ভারতবর্ষের সরকারি ক্ষমতার অলিন্দে তাই ধর্মীয় গোষ্ঠীর নেতাদের দৃপ্ত আনাগোনা, রাষ্ট্রের কর্ণধারদের দেখা গেল ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলিকে প্রয়োজন মতো তোষণ করতে। এই অবস্থা সাম্প্রদায়িকতাবাদকেই পরিপুষ্ট করেছে। কিন্তু এই অবস্থা সৃষ্টির কোনো প্রয়োজন ছিল না।

সমাজতাত্ত্বিক অচিন বনায়েক তাঁর 'কমিউনালিজম কনটেস্টেড' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে আধুনিক সময়ে সমাজ ও সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় বিষয় ধর্ম নয়। তাঁর মতে, ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষকরণ পদ্ধতির ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার সাহায্যে ভারতীয় সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থার সম্ভাবনার পথ প্রশস্ত করা যেতে পারে। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান এই পথেই সম্ভব।

Scanned with CamScanner